ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No.1500-1506
Published by Scholar Publications,
Sribhumi, Assam, India, 788711

ভারতীয়দের জাপান যাত্রার প্রেক্ষাপটে ভারত-জাপান সম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা -১৮৯৩-১৯৪১

ড. পারমিতা দাস, *সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, পশিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.07.2025; Accepted: 18.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The cultural and spiritual ties between Japan and India have developed immemorially. Many Indians travelled to Japan, where they were influenced by the country's culture. Those were Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Netaji Subhash Chandra Bose, Rashbihari Bose, Radhabinode Pal, etc. Swami Vivekananda went to Japan in 1893 with his friends. Rabindranath Tagore went to Japan in 1916. He narrated his experience in his book 'Japan Jatrir Diary' (Diary of a traveller to Japan). Both of them contributed immensely to build cultural and spiritual ties between India and Japan. The objective of this essay is to analyse their contribution and its historical significance.

Keywords: Japan, India, Asia, Culture, Unity, Journey, Industry

ভারতীয়দের জাপানের প্রতি আগ্রহ প্রথম দিকে ছিল না। নবম থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত কিছু ঘটনার উল্লেখ ছাড়া ভারত-জাপান প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস নীরব ছিল। এই সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত থেকে পড়াশোনা করতে আসত ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও জাপান থেকে তাকাওকা শিন্নো নামে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি চীন হয়ে ভারতে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম পড়তে।[১] বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য জাপানীরা ভারতকে গৌতম বুদ্ধের পবিত্র ভূমি হিসেবে দেখত। জাপান থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, তীর্থ যাত্রী বৌদ্ধ ধর্মের লিপি পাঠ করার জন্য এক সময় এসেছিল বলা যায়। যদিও এই সম্পর্কে খুব স্বল্প উপাদান পাওয়া যায়।[২] ভারতকে ভালবেসে জাপানীরা বলত, 'তেনজিকু' মানে স্বর্গ।[৩] আধুনিক যুগে যেসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জাপানে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, জামশেদজী টাটা, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রা ও তাঁর প্রভাব আলোচনা। এর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রা ও ওকাকুরার ভারতে আসা ও তাঁদের যে এশিয়ার ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এই নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর ওকাকুরা তেনশিন নন, স্বামী বিবেকানন্দ, জামশেদজী টাটা এবং আরও অনেক জাপানী শিল্পী, পন্ডিত মানুষরাও এশিয়ার নবজাগরণ এবং ঐক্যর কারিগর ছিলেন। আর এই ঐক্যর উপাদান একদিকে যেমন ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অন্য দিকে ছিল শিল্প বিশেষত চিত্র শিল্প। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে একদিকে যেমন এই পন্ডিত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা আরোহণ করে দেশের ঐতিহ্য, স্বকীয়তা বজায় রাখার বাণী প্রচার করেছিলেন, আবার যখন এশিয়ার ঐক্য গড়ে তুলবার কথা বলছিলেন তখন জাপানকে সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ না করে ভারতীয়দের স্বকীয়তা বজায় রেখে এশিয়ার ঐক্যকে ধরে রাখার কথা বারবার বলেছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারত ও জাপান উভয়ের ইতিহাসেই পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়। এই সময় আমাদের দেশে কুসংস্কার ও অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে দুটি ধারা গড়ে উঠেছিল। বাংলায় এই সময় স্ংস্কারবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদী ধারা গড়ে উঠেছিল। মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও ধর্মীয় কাজের সাথে যুক্ত সংবেদনশীল মানুষ এগিয়ে এসেছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে। এদের মধ্যে উল্লখযোগ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি। এরই ফলশ্রুতি ছিল বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস।

অন্যদিকে জাপানেও পরিবর্তনশীলতার ধারা প্রবহমান। মেইজি যুগের আবির্ভাবে সেখানে তখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছিল। নতুন জাপানের নেতৃবর্গ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সমকক্ষ হওয়া। পশ্চিমী বিরোধী সম্রাট কোমেই-এর মৃত্যু এবং উদার স্বভাব মুৎসুহিতোর সিংহাসন প্রাপ্তি জাপান কর্তৃক পশ্চিমী সভ্যতা গ্রহণের পথ অধিকতর সুগম করে।[৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানের এই পরিবর্তনকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন-

> "ইওরোপ যে শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তি দ্বারাই তাঁকে ঠেকানো যায়। নইলে তাঁর চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনকালে তাঁর ওঠবার উপায় থাকবে না। এই কথাটি যেমন তাঁর মাথায় ঢুকল অমনি সে আর এক মুহূর্ত দেরী করলে না। কয়েক বছরের মধ্যেই ইউরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। ইতিহাসে এত বড় আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো ঘটে নি।"[৫]

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার ওথ-এর সর্বশেষ বা পঞ্চম অনুচ্ছেদে সম্রাটের নির্দেশ ছিল যে জাপানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের জন্য পৃথিবীর সকল দেশ থেকেই জ্ঞান ও শিক্ষণীয় বিষয় অন্বেষণ করতে হবে।[৬]

এই সময় থেকেই জাপানের সাথে অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরী ও বিজ্ঞান সম্মত ভাব বিনিময়ের কাজ শুরু হয়ে যায়। জাপান থেকে পণ্ডিত, শিল্পী, বিজ্ঞানীরা যেমন পাশ্চাত্য দেশে যায় তেমনি ভারতেও গিয়েছিল। ভারত থেকেও জাপানে অনেকে গিয়েছিলেন। এইভাবেই ভারত ও জাপানের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আদান প্রদান শুরু হয়েছিল। মে মাসের শেষের দিকে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীজী বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে অংশ গ্রহনের জন্য শিকাগো শহরে গিয়েছিলেন। এই সময় তিনি হংকং ও জাপান হয়ে আমেরিকা পৌঁছে ছিলেন।[৭] ৩১শে মে, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে স্বামীজী 'পেনিনসুলার' নামে জাহাজে যাত্রা শুরু করেন। সেই জাহাজ ১৩ই জুন হংকং পৌঁছানোর পর ২৪শে জুন 'ভেরোনা' নামে আর একটি জাহাজে করে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। জাপানে তিনি দু-সপ্তাহে কোবে, নাগাসাকি, ওসাকা, কিয়োটো, টোকিও, এবং ইওকোহামা ভ্রমণ করেন। জাপান থেকে দুজন ব্যক্তির সাথে পত্রালাপ করেছিলেন। একজন ছিলেন মাদ্রাজে আলাসিঙ্গা পেরুমল যিনি স্বামীজীর বিদেশ যাত্রার খরচ দিয়েছিলেন। আরেকজন ছিলেন ক্ষেত্রীর মহারাজা।[৮] জাপানের শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। জাপানের মানুষ, পোশাক পরিচ্ছদ সহ জাপানকে এক কথায় ছবির মতো মনে হয়েছিল।

স্বামীজী ভারতকে কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত করা যায় ভাবতেন। তাই তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিশ্বে। জাপান ভ্রমণ করে তিনি পাঁচটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রথমতঃ জাপানীদের প্রখর আত্মবিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ জাপানীদের তাঁদের দেশের প্রতি প্রচন্ড ভালোবাসা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তৃতীয়তঃ জাপানীরা তখন তাঁদের মধ্যযুগীয় মানসিকতা কাটিয়ে সর্ম্পূর্ণভাবে দেশকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলেছিল। চতুর্থতঃ জাপান পাশ্চাত্য দেশের থেকে প্রযুক্তি ও চিন্তা গ্রহণ করে তাঁদের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু মনে প্রাণে তারা জাপানী রয়ে গিয়েছিল। তারা ইউরোপীয় হয়ে যায় নি। সর্বোপরি, তারা সমগ্র জাপানে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে জাপান এই যুগ সন্ধিক্ষণের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।[৯] স্বামীজী জাপানীদের এই গুণ ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় যুব সমাজকে উৎসাহ দিতেন অন্তত একবারের জন্য হলেও জাপান ভ্রমণ করতে, সেখানকার প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং ফিরে এসে সেই জ্ঞানকে ভারতে প্রয়োগ করতে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের কথা লিখেছিলেন। প্রথমে তিনি বলেছিলেন,

> "পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদন্ডহীন সে চারদিক হইতে কতকগুলো এলোমেলো ভাব পাইয়াছে-সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান নয়।"[১০]

তিনি বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছুই বর্জন করা উচিত না। তিনি ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলিকে আত্মীকরণের কথা বলতে থাকেন। স্বামীজীর দুঃখ এটাই ছিল যে ভারতীয়রা ইউরোপে গেলে পাশ্চাত্যবাদী হয়ে যায় এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে।[১১] কিন্তু তাই বলে তিনি এমনও চান নি যে ভারত সম্পূর্ণভাবে জাপানের মতো হয়ে যাক। তিনি শুধু চাইতেন ভারত তাঁর নিজস্বতা বিসর্জন দেবে না।[১২] জাপানে তিনি ওকাকুরা তেনশিনের কাছে জাপানী শিল্পকলা শিখেছিলেন। সেই সময় ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন মিস ম্যাকলয়েডকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন, "জাপান ভারতকে যে সাহায্য দেবে তা সম্মান ও সহমর্মিতার সাথে দেবে।"[১৩]

আরেকজন ভারতীয় যিনি জাপানে গিয়েছিলেন এই সময় তিনি ছিলেন শিল্পপতি জামশেদজী টাটা। সম্ভবত ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়োকোহামাতে ওরিয়েন্টাল হোটেলে তাদের যোগাযোগ হয়েছিল। এরপর তারা 'এক্সপ্রেস অফ ইন্ডিয়া' নামে একই জাহাজে করে ভ্যাঙ্কুওভারে পৌঁছেছিলেন। এই সময় বোম্বাইয়ের একজন শিল্পপতি হিসেবে জামশেদজীর নাম স্বামীজী জানতেন কিন্তু স্বামীজীর নাম জামশেদজী জানতেন না। জামশেদজী টাটা স্বামীজীর সম্পর্কে জাপানীদের থেকে শুনেছিলেন যে কয়েকজন জাপানী স্বামীজীকে দেখেছিল যিনি গৌতম বুদ্ধের মতো দেখতে।[১৪] স্বামীজী জাপানের প্রযুক্তিগত বিকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই প্রযুক্তি ভারতে আনার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর সাথে জামশেদজীর দশ দিনের সাক্ষাৎকারের সময় এই কথাই বলেছিলেন। অন্য দিকে জামশেদজী ইংলন্ডের 'পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি'র সুতী বস্ত্রের ওপর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য জাপানের 'নিপ্পন ইউসেন কাইশা লাইন'-এর সাথে চুক্তি করেন, যেখানে টাটা নিজের স্টিমারে অল্প দামে সুতীর দ্রব্য রপ্তানী করতে রাজী হয়েছিল। প্রথম দিকে তিনি সফল হয়েছিলেন। কিন্তু ইংলন্ডের 'পি অ্যান্ড ও কোম্পানি' এবং বিদেশী কোম্পানি টাটার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর সহকর্মীদের সরিয়ে আনেন।[১৫] স্বামীজী যখন জানতে পারেন জামশেদজীর এই যাত্রার উদ্দেশ্য স্টিল প্রযুক্তিকে ভারতে নিয়ে আসা, তখন স্বামীজী বলেছিলেন যে, স্টিল প্রযুক্তির দুটো অংশ স্টিল বিজ্ঞান এবং তৈরী করার প্রযুক্তি। স্বামীজী বলেছিলেন জামশেদজীকে বস্তুগত প্রযুক্তি নিয়ে আসতে হবে আর বস্তুগত বিজ্ঞান নিজের দেশে গড়ে তুলতে হবে।[১৬] পরে জামশেদজী ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সাইন্স গড়ে তুলবার জন্য অর্থ দিয়েছিলেন।[১৭] ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর মাসে বোম্বাই থেকে স্বামীজীকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন কিভাবে স্বামীজীর উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এই কাজে। স্বামীজী ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাতে জামশেদজীর এই কাজের প্রশংসা করেন।[১৮]

জাপানের দেশপ্রেম নিয়ে নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন, কোন জাতি, দেশপ্রেমকে এতদূর নিয়ে যায় নি, যা জাপানীরা করেছিল। তারা কথা বলে না, কাজ করে দেখায়। দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে। সেখানে অভিজাতরা কৃষক হিসেবে রয়েছে, তাঁদের রাজকীয়তা ছেড়ে দিয়েছে জাপানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য। জাপানের যুদ্ধে একজন বিশ্বাসঘাতক খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১৯]

স্বামীজীর পরে আরেকজন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব জাপানে গিয়েছিলেন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে, তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে তিনি তিন মাস ছিলেন এবং তাঁর উপর একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'জাপান যাত্রী' লিখেছেন। 'তোসামারু' জাহাজে করে রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়েছিলেন। জাপানী জাহাজের সাথে ইউরোপীয় জাহাজের পার্থক্য তাঁকে প্রথমেই মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন,

> "এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনিটা কিছুমাত্র লক্ষগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যারা তাঁর নিম্নতর কর্মচারী তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে। কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড় ঝাপটার মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি; দিব্যি সহজ ভাব। কথায়-বার্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েছে সে কাপ্তেন হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে।"[২০]

স্বামীজীর মতো তিনিও বলেছিলেন, জাপান পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষা লাভ করলেও নিজস্বতা বজায় রেখেছিল। তাঁদের কাজের কর্তা তারা নিজেরাই ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনেক পরে জাপানে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি বলেছিলেন, পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কি আকার ধারণ করবে, সেটা স্পষ্ট করে দেখার সময় তখনও আসে নি। কিন্তু তিনি তাঁর জাপানী জাহাজের অভিজ্ঞতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অসামঞ্জস্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা দেখেছিলেন।[২১] তাঁর কাছে জাপান যাত্রা ছিল পবিত্র স্থানে তীর্থ যাত্রার মতো।[২২] জাপানে গিয়ে তিনি জাপানী বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, শিল্পী ও কবিদের সাথে মিলিত হন। সেখানে টোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্য মেসেজ অব ইন্ডিয়া টু জাপান' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১১ই জুন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, জাপান হল এশিয়ার মধ্যে প্রথম দেশ যা পশ্চিমের থেকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করেও নিজস্বতা বজায় রেখেছিল।[২৩] এরপর জাপানে তিনি আবার যান ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে। এই সময় তিনি জাপানী শিল্পী ওকাকুরার অনুরোধে চীন হয়ে জাপান গিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয়বারেও তিনি এশিয়ার নবজাগরণের উপর জোর দিয়েছিলেন।[২৪] একজন জাপানী লেখক ইওশিরো নাগায়ো বলেছিলেন, কোন বিদেশী জাপানীদের এত উৎসাহিত করতে পারেন নি।[২৫] নাগানোতে মহিলা কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তোমি কোরা নামে একজন ছাত্রী গুরুদেবের শিষ্য হয়ে যান। পরে তিনি শান্তিবাদী আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং গুরুদেবের সাথে দো-ভাষী হিসেবে অনেক জায়গায় যান।[২৬]

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম এলেও জাপান যে ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সংযমের দিক আর একদিকে মৈত্রীর দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে তা আমাদের দেশ পারে নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্যবোধ।"[২৭] তিনি মনে করতেন শুধু ইউরোপ নয় জাপানের থেকেও মানুষের শেখবার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু জাপানের প্রবাসী ভারতবাসীরা

> "ইউরোপের নানা অনাবশ্যক, নানা কুশ্রী জিনিষও নকল করেছে; কিন্তু তারা কি জাপানের কোন জিনিষই চোখে দেখতে পায় না? তারা এখান থেকে যে বিদ্যা শেখে সেও ইউরোপের বিদ্যা, এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্য রকম সুবিধা আছে তারা কোনমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের তাঁর মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিষ কিছুই দেখি নে?"[২৮]

তিনি বলেছেন,

> "জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিষ ইউরোপের থেকে আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি এমন ইউরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবন যাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তা হলে আমদের ঘর দুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করার শক্তি আমাদের নেই।"[২৯]

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের মে-জুন মাসে আবার তিনি জাপান যান ভ্যাঙ্কুওভার থেকে ফেরার পথে।[৩০] ওকাকুরা তেনশিন একজন বিখ্যাত জাপানী শিল্পী ছিলেন, যিনি জাপানের ঐতিহ্যবাহী শিল্প নিয়ে চর্চা করতেন। স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই ওকাকুরার সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি কবি গুরুর আগে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে এশিয়ার বৌদ্ধদের নিয়ে একটি সম্মেলন সংগঠিত করা। ওকাকুরা তাঁর বই 'দ্য আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট'-এ এশিয়ার ঐক্যর কথা বলেছিলেন এবং এশিয়ার এই ঐক্য কে পুনরায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন আছে মনে করতেন।[৩১] এই বইয়ে তিনি বলেছিলেন, "এশিয়া ইজ ওয়ান"। তিনি বলেছিলেন, এশিয়ার জীবন চর্যা ও শিল্প চর্চার একটি বিশেষ ধরণ আছে, যার নাম দিয়েছিলেন "এশিয়াটিক মোডস"। আজকে এশিয়া বা এশিয়াবাসীর দায়িত্ব এই কাজকে রক্ষা করা ও জাগিয়ে রাখা। এই বইয়ের শেষ বাক্য ছিলঃ "আমাদের ভিতরে আছে জয়ের প্রতিশ্রুতি, সেই জয় অর্জন করতে না পারলে বাইরে অপেক্ষা করে থাকে মৃত্যু।"[৩২] তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দ্য অ্যাওয়েকেনিং অব জাপান' গ্রন্থে বলেছিলেন পাশ্চাত্যের গৌরব এশিয়ার পক্ষে অপমানজনক।[৩৩] আরেকজন ছিলেন চিকুরো হিরোইকে, জাপানের একজন শিক্ষাবিদ গুরুদেবের সাথে জাপানে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং তারাও এশিয়ার সব ধর্মের মধ্যে ও দেশের মধ্যে ঐক্যর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৩৪]

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে ওকাকুরা প্রথম ভারতে এসেছিলেন এবং গয়া, নালন্দা, বোম্বাই ভ্রমণ করেন। তখন বেশিরভাগ সময় তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেই ছিলেন। ওকাকুরা ভারতে আসার আগেই স্বামী বিবেকানন্দ জাপান গিয়েছিলেন। কিন্তু বলা হয় ওকাকুরা, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা চেতনার সাথে জাপানীদের পরিচয় করাতে তাঁকে জাপানে আহবান করেছিলেন।[৩৫] কলকাতায় এসে ওকাকুরার নিবেদিতার সাথেও পরিচয় হয়েছিল এবং নিবেদিতা বিপ্লবী তরুণদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়েছিলেন। মিসেস ওলি বুলের একটি পার্টিতে নিবেদিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ওকাকুরার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সাথে পরিচয়ের পর জাপান ও পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল জেগেছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই ওকাকুরার থেকে প্রাচ্যের শিল্পকলা সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হন।[৩৬] ওকাকুরাও জাপানীদের উৎসাহিত করেছিলেন ভারতকে জানতে। তাই সেখান থেকে শিতোকু হরি নামে একজন জাপানী ছাত্র এসেছিল শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়তে।[৩৭] আরও দুজন জাপানী শিল্পী তাইকান ও হিশিদাকে ওকাকুরা ভারতে পাঠান। এখানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ কলকাতার অনেক শিল্পী তাঁদের থেকে জাপানী জল রঙের ওয়াশ পদ্ধতি শেখেন।[৩৮] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাইকান প্রসঙ্গে বলেছেন,-"তাঁর কাছেই শিখলুম একটি লাইন কত ধীরে টানে তারা।"[৩৯] "জাপানি প্রথাগত ধ্রুপদী চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য সংবৃতি অর্থাৎ কত কম কথা বলে কত বেশি ভাবের ব্যঞ্জনা আনা যায়। জাপানি কবিতা বিশেষত 'হাইকু'-তে আমরা এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এটা পাশ্চাত্যের স্বাভাবিকতাবাদের অতিকথন প্রক্রিয়ার একেবারে বিপরীত প্রক্রিয়া।"[৪০] ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের ঔপনিবেশিক শিল্প ঘরানা থেকে বেরিয়ে এসে প্রাচ্য ঘরানায় আঁকতে উৎসাহিত করতেন।[৪১] ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে নন্দলাল বসুও চীন ও জাপানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি চৈনিক ও জাপানি শিল্পের উপর কিছু লেখা সংগ্রহ করেছিলেন এবং ওকাকুরার মূল নীতিঃ ঐতিহ্য, প্রকৃতি এবং স্বাত্যন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৪২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে ১৯০৫ সালে জুজিৎসু শেখানোর জন্য জাপান থেকে জিন্নোসুকে সানো তাঁর স্কুলে জাপানী ভাষাও শেখাতেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর সানো্র থেকে জাপানী ভাষা শিখতেন এবং তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সানো্র জুজিৎসু ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। সানো গুরুদেবের উপন্যাস 'গোরা' সহ অনেক কাজ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।[৪৩]

১৯২৯ সালে আবার তিনি জাপানে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি কাগজের ব্যবসায়ী কুনিহিও ওকুরার বাড়ি ছিলেন এবং তাঁকে আরও একটি জুজিৎসু শেখানোর শিক্ষক শান্তিনিকেতনে পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন। ওকুরা জুজিৎসো সংস্থা কিয়োদোকানের প্রতিষ্ঠাতা জিগারো কানোর সাথে আলোচনা করে শিঞ্জো তাকাগাকিকে শান্তিনিকেতনে পাঠান। শিঞ্জো ২০টি জুডোর পোশাক নিয়ে গিয়েছিলেন যার জন্য কবিকে যাতায়াতের খরচ সহ মোট ১০০০ ইয়েন দেবার অনুরোধ করেছিলেন। এই সময় ওকুরা কবিকে পাঁচটি বাক্সে জাপানী কাগজ পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রকাশের জন্য। এছাড়া 'দাইনিহনশি' জাপানের ইতিহাসের বারোটি খন্ড পাঠিয়েছিলেন। কবিগুরুও তাঁর বই ওকুরাকে পাঠিয়েছিলেন।[৪৪]

ভারতের অন্যতম বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সালে জাপানে গিয়েছিলেন পি.এন. ঠাকুর ছদ্ম নামে। প্রিয়নাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়। যেহেতু ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ওকাকুরার উদ্যোগে উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তাই রাসবিহারী বসু মনে করেছিলেন এই ছদনামে তিনি কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই জাপানে প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাই হয়েছিল।[৪৫] রবীন্দ্রনাথের সাথে রাসবিহারী বসুর দেখা হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় জাপান ভ্রমণের সময়। এই সময় গুরুদেব স্বদেশের স্বাধীনতার কাজে রাসবিহারীকে উৎসাহিত করেন। জাপানের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী ও রাসবিহারীর আশ্রয়দাতা গুরু তোওয়ামা মিৎসু এই সাক্ষাতের কথা জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন কেন রাসবিহারী বসু পি এন ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে প্রবেশ করেছিলেন।[৪৬] গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর তৃতীয় জাপান ভ্রমণের সময় রাসবিহারী বসুর শ্বশুরবাড়ি যান এবং গুরু তোওয়ামা মিৎসুর সাথে সেখানে আলাপ হয়। গুরু তোওয়ামা মিৎসু তাঁর গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন 'গেনয়োওশা'র পক্ষ থেকে কবিকে স্ংবর্ধনা দেন। সেই অনুষ্ঠানে ভারতের বিপ্লবীদের আশ্রয়দান এবং সহযোগিতার জন্য তোওয়ামা মিৎসুর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৪৭]

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ এশিয়ার মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। জহরলাল নেহেরু তাঁর বই 'গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' গ্রন্থে লিখেছিলেন একটি এশিয় দেশ হিসেবে জাপানের জয়লাভ এশিয়ার অন্যান্য দেশের ওপর সুদুরপ্রসারী প্রভাব ছিল।[৪৮] ডি এস রামচন্দ্র রাও তাঁর 'ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' গ্রন্থে লিখেছিলেন এক শতকের ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তুলতে পারে নি যথেষ্টভাবে যা রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ পেরেছিল। জাপানের এই জয় এশিয়াবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছি।[৪৯] তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছিল একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যদিকে ওকাকুরা তেনশিনের প্রভাব।স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, আমাদের মেরুদন্ড হল আধ্যাত্মিকতাবাদ।[৫০]এই আধ্যাতিকতাবাদ ভারত ও জাপানের সাংস্কৃতিক নেতাদের বিংশ শতকের শুরুতে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল। প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক কাজ ও সাংস্কৃতিক কাজে একদিকে পাশ্চাত্য বিরোধিতার ও অন্যদিকে এশিয়ার ঐক্যর মন্ত্র তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের নিরলস কাজ, ভাবের আদান প্রদানের ফলে এশিয়ার ঐক্য বোধ শক্ত হয়েছিল এবং উভয় দেশের মধ্যে তৈরী হয়েছিল এক আত্মিক ও সাংস্কৃতিক মেল বন্ধন। এই সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের ফলে পরবর্তীকালে রাসবিহারী বসু এবং সুভাষচন্দ্র বসু দ্রুত জাপানের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন আর জাপানের মাটি থেকে শুরু হয়েছিল এক নতুন পর্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলন- এশিয়ার স্বাধীনতার আন্দোলন বনাম পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন। ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এশিয়ার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল যার ভিত্তি ভূমি তৈরী করেছিলেন প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ওকাকুরা তেনশিন তাঁদের ঐক্য মন্ত্রের দ্বারা।

তথ্যসূত্র:

১. মেধাসানন্দ, স্বামী। দ্য স্টোরি অব ইন্ডিয়া-জাপান রিলেশনশিপ। স্বামী বিবেকানন্দ। অ্যান্ড ওকাকুরা টেনশিন: দ্য মডার্ন এরা পাওনিয়ারস। অদ্বৈত আশ্রম, ২০২০, পৃ: ২৯।

২. তদেব, পৃ: ২৯।

৩. ভার্মা, সত্য ভূষণ। ইন্ডিয়া অ্যান্ড জাপান অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল ডায়লগ। ইন্দো-জাপান রিলেশনস চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরছুনিটজ। ধর্মদাসানি, এম. ডি., সম্পাদনা, কনিষ্ক পাবলিশার অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটার, ২০০৪, পৃ: ২৩।

৪. চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ। জাপানের ইতিহাস। এ মুখার্জি এন্ড প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃ: ৫৩।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পারস্যে। রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৯১।

৬. চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ। পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১।

৭. মেধাসানন্দ, স্বামী। পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৪।

৮. তদেব, পৃ: ৭২-৭৩।

৯. তদেব, পৃ: ১১৫।

১০. সেন, পৃথ্বিরাজ। ভারতাত্মা বিবেকানন্দ, গীতাঞ্জলি। ২০১৫, পৃ: ১৩৫।

১১. মেধাসানন্দ, স্বামী। পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৫।

১২. মেধাসানন্দ, স্বামী। পূর্বোক্ত, পৃ:১১৭।

১৩. তদেব, পৃ: ১১৭।

১৪. তদেব, পৃ: ১২০।

১৫. তদেব, পৃ: ১২৫।

১৬. তদেব, পৃ: ১২৫।

১৭. তদেব, পৃ: ১২৫।

১৮. তদেব, পৃ: ১২৮।

১৯.Swami Vivekananda's Admiration for the Japanese, http://www.swamivivekananda.guru/2018/09/22swami-vivekananda-admiration-for -the-japanese/, প্রবেশের তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪১।

২১. তদেব, পৃ: ৪৫।

২২. ভার্মা, সত্য ভূষণ। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬।
২৩. মুখার্জী, তপতী। রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরস ফার্স্ট ভিজিট টু জাপান। কিনি, গীতা, এ, রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যান্ড জাপান। সম্পাদনা, বিশ্বভারতী, ২০১৭, পৃ: ৪৭।
২৪. ধর্মদাসানি, এম, ড। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬।
২৫. কাওয়াগুচি, মিৎসুও। মেসেজেস অব গুরুদেব ট্যাগোর। কিনি, গীতা, এ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩।
২৬. তদেব, পৃ: ৫৪।
২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পৃ: ৮৭।
২৮. তদেব, পৃ: ৮৭।
২৯. তদেব, পৃ: ৯২।
৩০. ধর্মদাসানি, এম, ডি, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬।
৩১. তদেব, পৃ: ২৬।
৩২. ঘোষ, মৃনাল, অবনীন্দ্রনাথের ছবি: সৃজনের প্রেরণা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সুব্রত দেবনাথ, সম্পাদনা, নান্দনিক সময়, অষ্টাদশ সংখ্যা, কলকাতা নান্দনিক, ২০২৩
৩৩. ঘোষ, মৃনাল, কলকাতা তথা বাংলায় এসেছিলেন যে বিদেশী শিল্পীরা, তাপস ভৌমিক, সম্পাদনা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, জানুয়ারি-এপ্রিল, বইমেলা সংখ্যা, ২০২৩।
৩৪. তাকেউচি, কেইজি। দ্য আইডিয়াস অব রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যান্ড চিকুরো হিরোইকে অন এডুকেশন। কিনি, গীতা, এ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯।
৩৫. চ্যাটার্জী, সত্যম। বিদেশী থেকে স্বদেশীঃ প্রসঙ্গ ওকাকুরার ভারত ভ্রমন। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, জানুয়ারি-এপ্রিল, বইমেলা সংখ্যা, ২০২৩
৩৬. তদেব, পৃ: ৩৪১।
৩৭. তদেব, পৃ: ৩৪১।
৩৮. ঘোষ, মৃনাল। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৪।
৩৯. ঘোষ, মৃনাল। পূর্বোক্ত, পৃ: ১২।
৪০. তদেব, পৃ: ১২।
৪১. গাঙ্গুলী, স্বাতী। ট্যাগোরস ইউনিভার্সিটিঃ আ হিস্ট্রি অব বিশ্বভারতী ১৯২১-১৯৬১। পার্মানেন্ট ব্ল্যাক,২০২২, পৃ: ২৪৬।
৪২. তদেব, পৃ: ২৫৭।
৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন। রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যান্ড হিজ জাপানীজ করেসপন্ডেন্স। অ্যান এনকাউন্টার বিটুইন টু সিভিলাইজেশনশ। রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যান্ড দ্য আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি ইন্দো-জাপানীজ কালচারাল কনফ্লুয়েন্স। সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, শ্যাম সুন্দর ভট্টাচার্য, সম্পাদনা, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৮, পৃ: ৮৪।
৪৪. তদেব, পৃ: ৯৫-৯৬।
৪৫. সরকার, বিকাশ, প্রবীর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান ভ্রমণের তাৎপর্য। অ্যান এনকাউন্টার বিটুইন টু সিভিলাইজেশনশ। রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যান্ড দ্য আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি ইন্দো-জাপানীজ কালচারাল কনফ্লুয়েন্স। সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, শ্যাম সুন্দর ভট্টাচার্য, সম্পাদনা, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৮, পৃ: ১৩৩।
৪৬. তদেব, পৃ: ১৩৫।
৪৭. তদেব, পৃ: ১৩৫।
৪৮. নেহেরু, জওহরলাল। গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি। পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস, ১৯৪৯
৪৯. ভার্মা, সত্য ভূষণ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪।
৫০. তদেব, পৃ: ২৪।